বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর ২০১৫ ॥ ১৬ আশ্বিন ১৪২২ ॥ ১৬ জিলহজ ১৪৩৬ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ২য় বর্ষ ৬ সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

মহররম মাসের তাৎপর্য

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

আরবি হিজরী সনের প্রথম মাস 'মহররম'। মহররম মাসে আল্লাহর সৃষ্টিজগতে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। তার মধ্যে ১০টি ঘটনা উল্লেখযোগ্য এই ১০টির মধ্যে একটি হচ্ছে 'আশুরা' এই ১০ মহররম ইসলাম ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা।

* আল্লাহপাক এই দিনে লওহে মাহফুজ ও প্রাণীকূলের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন।

* দুনিয়ার সমস্ত সমুদ্র-মহাসমুদ্র এবং পাহাড় পর্বত এই মহররম মাসের দশ তারিখে সৃষ্টি করা হয়েছে।

* হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহপাক মহররমের দশ তারিখে সৃষ্টি করে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়াছেন।

* হযরত রসুল (সঃ)-এর পূর্ব পুরুষ হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ (আঃ)-কে আল্লাহপাক মহররমের দশ তারিখে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন।

* এই মহররমের দশ তারিখে পুত্র হযরত ঈসমাইল (আঃ)-কে আল্লাহর হুকুমে কোরবানী করার হুকুম করা হয়েছিল।

* হযরত আদম (আঃ) বেহেশত হতে দুনিয়াতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর, এই মহরমের দশ তারিখে আল্লাহতায়ালা তার তওবা কবুল করেন।

* ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর পিছনে আক্রমণ করতে যাইয়া নীলনদে ডুবে প্রাণ হারিয়েছিল এই মহররমের দশ তারিখে।

* হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন এই দশ মহররমে দিনটিতে।

* এই দশ মহররমে হযরত রসুল (সঃ)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালার প্রান্তরে পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথী মোট ৭২ জন শহিদ হন।

* সর্বশেষ আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুযায়ী মহররম মাসের দশ তারিখে হযরত ঈসরাফিল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁকে কেয়ামত ঘটাবেন।

এই মাসের দশ তারিখকে ইয়াওমে আশুরা বলা হয়।

২-এর পাতায় দেখুন

কামেল পীর চেনার উপায়

যাহাকে দেখিলে আল্লাহতায়ালার কথা স্মরণ হয়, মনে ভয় আসে এবং ইবাদত বন্দেগীতে মন বসে, সে-ই প্রকৃত কামেল মুর্শিদ, আউলিয়া বা আল্লাহতায়ালার খাসবান্দা

হাদিসঃ হুমুল্লাজিনা ইযা-রুয়ু ওয়া উয-কুরুল্লাহা "যাহাকে দেখিলে আল্লাহতায়ালার কথা স্মরণ হয়, মনে ভয় আসে এবং ইবাদত বন্দেগীতে মন বসে, সে-ই প্রকৃত কামেল মুর্শিদ, আউলিয়া বা আল্লাহতায়ালার খাসবান্দা "

হযরত মাওলানা খলিলুর রহমান সাহেব শামছুল আরেফিনেতে লিখিয়াছেন- ইহা সকল লোকের জন্য নহে। যাহাদের ভিতর আল্লাহর জিকির জারি নাই অর্থাৎ যাহাদের দিলে আল্লাহ আল্লাহ জিকির হয় না, তাহারা বুঝিতে পারিবে না। আর যাহাদের দিলে গাফলত (অলসতা) দূর হইয়াছে অর্থাৎ, আত্মা জিন্দা হইয়াছে তাহারাই কামেল মুর্শিদ বুঝিতে বা চিনিতে সক্ষম।

আরও একটি কারণ এই যে, যাহাদের ভিতর দশগাছ রশি উত্তম ও এশকের মাদ্দা যাহাদের ভিতর বেশি, তাহারা যদি কোন অলিয়ে কামেলের প্রতি মহব্বতের নজরে দেখে, কোরআন-হাদিসের কথা শোনে, তবে অনেক সময় নবীর নূরে নবুয়তের তাছির বা অলিয়ে কামেলের দিলের ফয়েজ ওই ব্যক্তিদের দিলে পতিত হয় এবং দিলের ভিতর তাছির হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের মন ওই দিকে ঝুকিয়া পড়ে। যাহাদের ওই দশগাছ রশি সবই খারাপ তাহাদের ভিতরে এশকের মাদ্দা থাকে না। কাজেই তাহাদিগকে অলিরা যদি হাজারও বুঝায় বা উপদেশ দেয় ও কোরআন-হাদিসের কথা হাজারও শোনে তবুও তাহাদের ভিতর তাছির হয় না।

ইহাই ঠিক কথা, কারণ রসুল পাক (সঃ)-এর হুজুরে যে আসিত, তাহাদের দিল মহব্বতে গলিয়া যাইত এবং সাথে সাথে সে মুসলামন হইয়া যাইত। কিন্তু আবু জাহেল ও আবু লাহাব প্রমুখ কাফেরগণ কখনও রসুলুল্লাহর গুণ বুঝিতে পারে নাই। এ জামানার লোকের অবস্থাও তদ্রুপ হইবে। পীরকামেলের নাম শুনিয়া কত লোক ফয়েজে বে-এখতিয়ার (অস্থির) হইয়া যায়, আবার এমন লোকও আছে, যাহারা কামেল লোকের চেহারা দেখিয়াও তাহাকে বিশ্বাস করে না ও তাহাকে শত-সহস্রবার বুঝাইলেও বুঝ নেয় না। জাকের সকল সহজেই বুঝিতে পারে যে, মিথ্যা কথা বলিলে, হারাম খাদ্য আহার করিলে বা অন্যান্য পাপের কাজ করিলে দিল বন্ধ অর্থাৎ, আল্লাহর জিকির বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া যায় এবং ফয়েজ বন্ধ হইয়া যায়। আর যে সমস্ত লোক আজীবন হারাম খাদ্য আহার করিয়া বা নানা প্রকার গুনাহর কাজ করিয়া দিল কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা কি প্রকারে মুর্শিদে কামেল চিনিতে পারিবে?

যিনি কামেল মোকাম্মেল পীর হইবেন, শরিয়ত ও মারেফতের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকিতে হইবে। কমপক্ষে শরিয়তের বিধানসমূহ ভালরূপে জানা থাকিবে এবং এলমে লাদুন্নাতে তাঁর পূর্ণ অধিকার থাকিবে। শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন ও তদনুযায়ী কাজ করিবেন। শরিয়ত বিরোধী কাজ হইতে দূরে থাকিবেন। খোদাতায়ালাকে ভয় করিবেন ও মুত্তাকী হইবেন এবং পরহেজগার হইবেন।

কামেল বা মোকাম্মেল পীরের ভিতর এই তিনটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। পীরের নিকট হইতে ছবকসমূহ আয়ত্ত করা, ফয়েজ হাসিল করা ও মুরিদদের ভিতর ফয়েজ পৌঁছানোর ক্ষমতা থাকা।

যিনি কামেল হইবেন তিনি লোভ শূন্য হইবেন। কেন না লোভী ব্যক্তি কখনও ফকির হইতে পারে না।

'কওলোল জামিল' কিতাবে আছে, অনেকে মনে করে থাকেন যে, বার মাস রোজা রাখিতে হইবে, স্ত্রী হইতে দূরে থাকিতে হইবে, খানা খাইবে না ও জঙ্গলবাসী

২-এর পাতায় দেখুন

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের মহা-মূল্যবান নছিহত

১, নামাজ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, ইবাদতে আকবর। তাই সকলেই আপনারা হুজুরী দিলে নামাজ পড়ার চেষ্টা তদবির করবেন।

২, শরিয়তের ছোট-বড় হুকুমকে মান্য করবেন, তবেই মারেফত সহজ হয়ে যাবে।

৩, অন্যের দোষ দেখার পূর্বে নিজের দোষ দেখুন, তবেই কল্যাণ।

৪, মা-বাবাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সেবা-যত্ন করবেন।

৫, বড়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করবেন, ছোটকে স্নেহ-মোহব্বত করবেন।

৬, ভুখা মানুষকে খানা খাওয়ালে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করলে, অসুস্থকে সেবা করলে, এসব সেবা আল্লাহতায়ালা নিজে গ্রহণ করেন।

৭, আগুন যেভাবে লাকড়ি বা কাঠকে খেয়ে ফেলে, হিংসা সেভাবে মানুষের নেক পূণ্য খেয়ে ফেলে।

৮, কিতাবে আছে, চব্বিশ হাজার ছয়শত বার কোন জায়গায় আছে একুশ হাজার ছয়শত বার ২৪ ঘন্টায় দম আসা-যাওয়া করে। শ্বাস টানতে 'আল্লাহ' ছাড়তে 'হু' এই অভ্যাস করবেন। তাই আল্লাহতায়ালা কোরআন মাজিদে আরো বলেন– 'আলা বি-জিকরুল্লাহি তাতমাইনূল কুলুব'। অর্থ- সাবধান! আল্লাহতায়ালার জিকিরই একমাত্র শান্তি।

বিশেষ বার্তা

বাংলাদেশের অন্য কোন দরবারের সঙ্গে যদি '... বাগ' শব্দটি সংযুক্ত থেকে থাকে, তবে তাদের সঙ্গে কুতুববাগ দরবার শরীফের কোনো সম্পর্ক বা নেছবত নেই। কুতুববাগ দরবার শরীফের অবস্থান : ৩৪ ইন্দিরা রোড (ইসলামীয়া চক্ষুহাসপাতালের দক্ষিণ পাশে), ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রচারে : কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের বাণী প্রচার কমিটি

কোরআন ও হাদিসের আলোকে সূফীবাদের শিক্ষা

বাদল চৌধুরী

সূফীবাদের শিক্ষা নতুন কোন বিষয় নয়, এ শিক্ষা সৃষ্টিলগ্ন থেকেই চলমান। যে শিক্ষার মাধ্যমে আত্মাকে চেনা ও জানা যায় তা-ই সূফীবাদ। আর দেহের ভিতর এবং বাহিরকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে, এ শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বিশ্ববিখ্যাত তাপস জুন্নুন মিসরি বলেছেন– 'জাগতিক লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে যিনি আল্লাহর আরাধনা-উপাসনাকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছেন তিনিই সূফী'। এ প্রসঙ্গে আরো এক প্রখ্যাত তাপস বশর হাফি বলেন– 'আল্লাহর জিকির দ্বারা যিনি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখতে পেরেছেন তিনিই সূফী'। আমার প্রাণপ্রিয় দরদী পীর-মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান বলেন– 'আল্লাহ ও রসুল (সঃ)-এর প্রেমে মজে জাগতিক সকল মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে, মহান আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা এবং দয়াল নবীজির আদর্শে জীবন পরিচালিত করার একমাত্র অভিষ্ঠ লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন তিনিই সূফী-সাধক'। এঁরা কঠোর রিয়াজত-সাধনা ও প্রেম-ভক্তির মাধ্যমেই আল্লাহ প্রাপ্তির পথ সহজ করেছেন। সূফীবাদ বিকাশের পথ পরিক্রমায় রসুল (সঃ) ছিলেন অগ্রপথিক। সূফীদের শাজরানামায় রসুল (সঃ)-এর নামটি প্রথম সূফী-সাধক বা তাসাউফ শিক্ষা গুরু হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। সমাজ ও মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূফীবাদের উন্মেষ ঘটেছে ওৎপ্রোতভাবে। ইসলাম ও সূফীবাদ হচ্ছে দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পৃক্তার মতোই। সূফীবাদ ইসলামের নিজস্ব সম্পদ এবং ইসলামী শরিয়তের আওতায় উদ্ভাসিত, যা যুগে যুগে উন্নতির শিখরে আহরণ করে ইসলাম ধর্মকে সারাবিশ্বের কাছে অনুকরণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে রহস্যাবৃতভাবে সূফীবাদের বীজ নিহিত রয়েছে। তাসাউফ তথা দার্শনিক চিন্তাধারার ইঙ্গিতও রয়েছে। আর পবিত্র কোরআনের

৩-এর পাতায় দেখুন

স ম্পা দ কী য় ক লা ম

মহরমের চাঁদ এল ওই কাঁদছে ফের দুনিয়ায়...

এক গভীর বিষাদের স্মৃতি নিয়ে মুসলিম জাহানে আবার বছর ঘুরে ফিরে এল পবিত্র মহররম মাস। হিজরি সন অনুযায়ী এই চাঁদের দশ তারিখ কারবালা প্রান্তরে আখেরী নবী আকায়ে নামদার তাজেদার মদীনা হযরত আহাম্মদ মুজ্তবা মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র, জগৎ জননী খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমার (রা:) নয়নমণি ইমাম হোসাইন (রা:) কে দামেস্কের (ইরাক) শাসক ইয়াজিদের বাহিনী নৃশংসভাবে কারবালার প্রান্তরে হত্যা করে। এর আগে ইমাম হাসান (রা:) কেও ষড়যন্ত্র করে বিষপান করিয়ে হত্যা করে নৃশংস ক্ষমতালিপ্সু ইয়াজিদবাহিনী। খোলাফায়ে রাশেদিনগণের ওফাতের পর ইসলামের ধারক ও বাহক হযরত ইমাম হাসান (রা:) এবং ইমাম হোসাইন (রা:) আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর আহলে বাইয়েত হিসেবে ইসলামের দাওয়াত বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়ার যে পবিত্র দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, তা ইসলামের প্রথম পর্যায়েই নির্মমভাবে বাঁধাগ্রস্থ হল কারবালার মর্মান্তিক ঘটনায়। হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছাহাবি হযরত মুয়াবিয়ার কুলাঙ্গার সন্তান ইয়াজিদ যে এত বড় নৃশংস ঘটনা ঘটাতে পারে, তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে অকল্পনীয়ই বটে। কিন্তু আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তা তাঁর জীবদ্দশায়ই জানতেন। তিনি সে বিষয়ে বর্ণনাও করেছিলেন তাঁর ছাহাবায়ে কেরামগণের কাছে।

কারবালার ইমাম হোসাইন (রা:)-এর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে। যাঁরা নবী প্রেমিক তথা আহলে বাইয়াতের অনুসারী, তাঁদের পক্ষে নবীজীর আওলাদদের হত্যা করা অসম্ভব। যারা এই নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তারা নবীজীর সত্য তরিকার অনুসারী হতে পারে না। অথচ আফসোস, ইয়াজিদ ও তার অনুসারীরা দাড়ি, টুপি, পাগড়ি এবং জোব্বাসহ সবকিছুতেই বাহ্যিকভাবে নবীজীর অনুসারীদের মত বেশ ধারণকারী ছিল। কিন্তু অন্তরে তাঁরা ছিল ইসলামের সত্য তরিকা বা আহলে বাইয়তের ঘোরতর বিরোধী। যে কারণে তারা ইসলামের লেবাসধারী হয়েও নবী-দুলাল ইমাম হাসান-হোসাইনকে খুন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। ইসলামের ইতিহাসে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা শুধু শোকের নয়, বিশ্বাসঘাতকতারও চরমদৃষ্টান্ত। ইমাম হোসাইন (রা:) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই বহু অনুরোধ করে তাকে কুফায় দাওয়াত করেছিলেন এজিদ ও তার অনুসারীরা। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের শত্রুরা কারবালা থেকেই চিহ্নিত হয়ে গেছে। তারা বংশপরম্পরায় এখনও পৃথিবীতে বিরাজমান। ইসলামী লেবাস পরেই তারা রসুল (সঃ)-এর বিরোধিতা করে চলেছে। মিলাদ, কিয়ামের বিরোধিতা করে। এমনকি কোরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা পর্যন্ত করে। সুতরাং মহররমের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সবার অন্তরে ধারণ করতে হবে। তবেই কারবালার শোক শক্তিতে পরিণত হবে, দয়াল নবীজীর সত্য তরিকা ও আহলে বাইয়াতের পথ প্রশস্ত হবে।

আল্লাহর দেখা পাবো

শেষ পৃষ্ঠার পর

মুখে। আর মুখে বললেই প্রেম হয় না, কাজেই নবীজির (সঃ) আদর্শের এ বিষয়গুলোর মধ্য দিয়েই বোঝা যায় যে, আমাদের অন্তরে কার কতটুকু নবীপ্রেম আছে!

বেলায়েতে মাশায়েখগণের মধ্যে দয়াল নবীজির (সঃ) এই বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। কারণ সত্যিকার অর্থে তাঁরা রসুল (সঃ)-এর প্রেমে মশগুল। যেমন ছিলেন বিশেষ বিশেষ সাহাবিগণ, খোলাফায়ে রাশেদীনগণ, আসহাবে সুফ্ফাগণ। নবীজির এ সব আশেক-পাগলেরা নবীজিকে অন্তর দিয়ে ভক্তি ও মহব্বত ছাড়া অন্য কিছুই বুঝতেন না। দয়াল নবীজিকে তো আমরা দেখি নাই অথবা ওই আমলে জন্মগ্রহণও করি নাই, তাহলে আমাদের উপায় কী হবে? নবীজিকে কোথায় পাব? কিভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে? প্রেম হবে? আল্লাহতায়ালা অতি মহান তাঁর মহানুভবতার পরিচয় এখানেও বিদ্যমান, সে কারণেই পথ হারা মানুষদের পথ দেখাতে যুগে যুগে বেলায়েতে মাশায়েখ নায়েব-এ নবী এ দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন। ভাবুক বা চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই এ কথা স্বীকার করবেন। আর তাই আপনার সময়ে যদি কামেল অলি-আল্লাহগণের দেখা পান তবে তাঁদের সঙ্গে প্রেম হলেই আস্তে আস্তে নবীজির (সঃ) প্রেম অন্তরে জন্মাবে। আর প্রেম করতে হলে আশেক-মাশুকের সঙ্গে দেখা-দেখির প্রয়োজন আছে। আমার কামেল মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান বলেন– 'কায়া দেখলে মায়া হয়'। তিনি আরোও বলেন, 'যার অবয়ব চর্ম চোখে দেখা হয় নাই, তার সাথে প্রেম হওয়ারও সম্ভাবনা নাই'। সত্যিই তো তাই, কিন্তু অনেকে আছেন যারা বেলায়াত মানেন না, অলি-আল্লাহ তথা পীর মাশায়েখ বিশ্বাস করেন না। তাদেরকে বলি, দূরে থেকে ভাল-মন্দ বিচার না করে অন্তত একবার খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে সামনা সামনি দেখে যান, জেনে যান তাঁর আদর্শ এবং শিক্ষা। দেখে যান তাঁর মধ্যে রসুল (সঃ)-এর গুনাগুণ পরিপূর্ণ বিদ্যমান আছে কি না। নিজের চোখে দেখে, ঠিক বেঠিক বুঝে তারপরে মন্তব্য করলেই কেবল তা গ্রহণযোগ্যতা পায়। আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক ঐশী প্রেমের শক্তি থাকে অলি-আল্লাহদের কাছে, যা আপনার আমার কাছে নাই। যে শক্তির গুণে তাঁরা মানুষের অতি কঠিন অন্তরেও প্রেমের বারিধারা তৈরি করতে পারেন। মানুষের খাসলত (বদ অভ্যাস) পরিবর্তন করে দিতে পারেন। জোর করে মানুষের অন্তর পরিবর্তন করা যায় না, যায় শুধু প্রেম দিয়ে। যেমনিভাবে করেছেন হায়াতুন্নবী, জিন্দানবী (সঃ)। অগণিত কাফের, মুশরিক, বেদুঈন তাঁর প্রেমপূর্ণ মায়াময় নূরাণী চেহারা মোবারক দেখে, তাঁর স্বভাব, আচার ব্যবহার, নি:স্বার্থ ভালোবাসা দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আর মহাপবিত্র এ ধর্মেরই নায়েব-এ-নবী আমাদের দরদী পীর-মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান, তাঁর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নূরাণী চেহারা মোবারক এক নজর দেখে যান আমার কথার সত্যতা যাচাই করেন। তাঁর মধুময় কণ্ঠ শুনেই মানুষেরা অন্তরে প্রাণ ফিরে পান। আর তাই তো রসুল (সঃ)-এর সত্য তরিকার ছায়াতলে শামিল হচ্ছে।

মহররম মাসের তাৎপর্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই মহররমের দশ তারিখে ইয়াজিদের হুকুমে ৭২ জন ইমাম বংশের আওলাদগণকে নির্মমভাবে শহীদ করেছিলেন। এই ইয়াজিদের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল অনৈসলামিক, পাপাচারপূর্ণ, নিষ্ঠুর, বন্যস্বভাব, অমানুষ, অধার্মিক, স্বেচ্ছাচারী এবং মনুষ্যত্ব তার ভিতরে নাই। ইয়াজিদের রাজ্যে হালাল বলতে কিছুই ছিল না, সব কিছুর ভিতরে হারাম ছিল ও আল্লাহ বিরোধী ছিল। মদ, জুয়া, ঘুষ, দূর্নীতি, জেনা ব্যাভিচার ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে-শাদী ইত্যাদি করাইতেন। এই সমস্ত আসামাজিক অনৈসলামিক গর্হিত কাজগুলো নিজে করে আনন্দিত হইতেন ও অন্যদেরকে করাইতেন বা করার জন্য উৎসাহিত করতেন।

এ সমস্ত কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য ইয়েমেন অধিবাসী মুনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ছদ্মবেশী ইসলামী পোশাকধারী, সে একজন ইহুদীর সন্তান ছিল। এই মুনাফেক চৌদ্দজন বিশিষ্ট গুপ্তচর দল গঠন করেন। তিনি মুসলিম রূপে আবির্ভাব হওয়ার পর ইসলামের মূল শিকড় কাটার জন্য সর্বপ্রথম পরিকল্পনা ছিল, উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে হত্যা করা ও অন্যান্য সাহাবিদেরসহ কোরআনের হাফেজদেরকে হত্যা করেছেন, যা এই অল্প লেখায় 'আত্মার আলো' পত্রিকায় লেখা সম্ভব হল না। কারবালায় ১০ মহররমে যে কুফাবাসী কুচক্রি ইয়াজিদের দল বাইয়াতের দাওয়াত দিয়ে ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে ষড়যন্ত্র করে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাদের দাওয়াতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কুফা শহরে যাবার সময় হোর নামক অনুতপ্তকারী কুফার পথে বাধা দিয়ে নিদারুন মরুপ্রান্তর কারবালার দিকে নিয়ে যান। ইমাম হোসাইন (রাঃ) জানতে পারেন তাঁর শত্রুদের পরিকল্পনা, আহলে বাইয়াত ইমাম বংশ নিপাতের পরিকল্পনা, নবী প্রেমিকদের আঘাতের পরিকল্পনা ও ক্ষমতা লোভের পরিকল্পনা। ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইলমে লাদুন্না জ্ঞানের আধিকারী ছিলেন, তাই তিনি জানতে পারলেন ইয়াজিদ দল আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে শহীদ করিবেন।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) তেনার পুত্র জয়নুল আবেদীনকে তন্দ্রা থেকে উঠাইয়া নিজের সিনা মোবারকে স্বজোরে চাপিয়া বা জড়াইয়া কিছু সময় ধরে রাখলেন এবং তাওয়াজ্জোহ্ এত্তেহাদি (রুহানী এলেম) প্রদান করলেন। তারপর ইমাম হোসাইন (রাঃ) আওলাদে রসুল আহলে বাইয়াত ও সঙ্গী-সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন– 'তোমরা আমার এই পুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীনকে প্রাণভরে ভক্তির সাথে আদর যত্ন করিবে। নানাজান নবী করিম (সঃ)-এর গুপ্তধন, আমার মা জগৎ জননী মা ফাতেমা, আমার বাবা হযরত আলী (রাঃ) এবং আমার ভাই হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হইতে আমি লাভ করেছিলাম। তাই শহীদ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ইমাম জয়নুল আবেদীনের বুকে গচ্ছিত বা আমানত রেখে গেলাম। আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ)-এর উছিলায় নবীজির এলমে বেলায়েত 'রুহানী অনুশাসন' সিনা-বসিনা হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় জারি থাকিবে।

তারপর জয়নুল আবেদীনকে চুম্বন করে তাঁর ফুফু আম্মা জয়নব (রাঃ) কাছে তত্তাবধানে ছেড়ে দিলেন। নবীজির পর দুনিয়ায় আর কোন নবী আসবেন না, কিন্তু তাঁর এই বাতেনী বিদ্যা এলমে বেলায়েতের গুণে গুনান্বিত হয়ে নায়েবে নবীর (আউলিয়া কেরাম) আগমন ধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আর যাহারা আহলে বাইয়াতের আনুগত্য করল, তাহারা ইসলামের মধ্যে আছে। আর যাহারা আনুগত্য করল না, তাহারা ইসলাম হইতে খারিজ।

কামেল পীর চেনার উপায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হইতে হইবে আসলেই এই সব শর্ত নহে। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জামানায় যেমন অজদ, গোলবা, ছুকুর ও বেখোদী ইত্যাদি নানা প্রকার জজ্বা ছিল, কামেল পীরের মুরিদানের মধ্যেও রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জামানার ন্যায় মাঝে মাঝে দুই এক জনের ওই সকল হালত হইবে। কেন না আউলিয়াগণ রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণ পাইয়া থাকেন। আহ্ইয়া উলুমউদ্দিন কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে অজদের বয়ান দেখুন যে, আসহাবগণের কিরূপ অজদ হইয়াছিল। এই জামানার মুমিনগণের তাহাদের চেয়ে (১) ছবুরের শক্তি শত শত গুণে কম। কাজেই এ জামানার জিকিরকারীগণের তাহাদের চেয়ে শত শত গুণে বেশি বেকারার (অস্থির) হওয়ার কথা।

বর্তমানে ভণ্ড পীর হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, একদল নামধারী পীর আছে, তারা 'আমেল সিফলি' আমলিয়াতের সাহায্যে জিন-পরী আবদ্ধ করিয়া ও কিছু বইপুস্তক পড়িয়া, পানি পড়া, তাবিজ-কবজ, ঝাড়ফুঁক ও কুফরি কাজের দ্বারা যাদু-টোনা-বান করিয়া উহার সাহায্যে জনসাধারণের (অশিক্ষিত মূর্খ লোকের) নিকট ছদ্মবেশী পীর সাজিয়া রুজির পথ করিয়া থাকে। আর ভিতরে ভিতরে নানা প্রকার পৈশাচিক কার্য করিয়া থাকে। আর বলিয়া বেড়ায়– রোজা নামাজ কিছু না, এই সকল ইবাদতের কোন আবশ্যক নাই। আমার নিকট মুরিদ হইলে এই সকল ইবাদত করা লাগবে না। এবং এ সম্বন্ধে নানা প্রকার কুতর্ক করিয়া থাকে। ইবাদতের দায় হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে ভাবিয়া, অনেক জাহেল অশিক্ষিত লোক তাহাদের মুরিদ হইয়া থাকে। কেবল গানবাদ্য, গাজা, নেশা তাহাদের ইবাদত মনে করে থাকে। বে-শরা লোকদিগকে কখনও কামেল বলিয়া বিশ্বাস করিতে নাই। তীর যেমন ধনুক হইতে যত দ্রুত চলে যায়, তার চেয়েও দ্রুত চলে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। কিতাবে আছে, কেহ যদি বাতাসের ওপর দিয়া উড়িয়া যায়, অগ্নির ভিতরে বসিয়া থাকে বা পানির উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, আর যদি সর্বদা সে শরিয়তের (১) খেলাফ কার্য করে তবুও তাহাকে বিশ্বাস করিও না। বর্তমানে আর একদল আলেম ও মৌলভী আছে, তাহারা কয়েক বছর মাদ্রাসায় পড়িয়া রুজির কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে কোন রাস্তা গতি না পাইয়া, একটা ঘর ভাড়া করে খানকা শরীফ নাম দিয়া, তাসাউফের দুই একটি কথা শিক্ষা নিয়া পীর সাজিয়া থাকে এবং পাগড়ি জোব্বা পড়ে বেশভুসা পড়িয়া বলিয়া বেড়ায়– আমি কামেল মুর্শিদ, কামেলপীর। কোন স্থানে কামেলপীরের মুরিদের মদ্যে অজদ, গোলবা, ছুকুর ও বেখোদী ইত্যাদি হালতের লোক দেখিলে নানা রকম ঠাট্টা ও বদনাম করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা পীর-মুরিদীর কিছুই জানে না। কেন না পূর্বেই বলা হইয়াছে, একদল পীর আছে, তাহারা পীরের নিকট গিয়া দুই একটি ছবক নিয়া পীরের এজাজত ছাড়াই ও পীরের খেলাফত ছাড়াই পীর সাজিয়া মুরিদ বানাইতেছে। তাহাদের শিক্ষায় ফয়েজ নাই, মুরিদের দিল জিন্দা নাই, অজদ, গোলবা ছুকুর ইত্যাদি মূল জিনিস কিছুই নাই কারণ, তাহাদের তাওয়াজ্জোহ দেওয়ার ক্ষমতা নাই। কেন না, পীরের বিনা হুকুমে ও বিনা খেলাফতে পীর সাজিয়াছে। স্বামী ছাড়া যেমন স্ত্রীর সন্তান আসে না, তেমনি কামেল মুর্শিদের পায়রুবি ছাড়া কামেল পীর হইতে পারে না।

বর্তমান সময়ে আর একদল পীর দেখিতে পাওয়া যায়, তারা শরিয়তী পীর দাবী করিয়া থাকে। তাহাদের ভিতর জাহেরাতে শরিয়তের কোনপ্রকার ত্রুটি দেখা যায় না। ফেটা পাগড়ি জোব্বা সবই আছে মূলত তাদের এলমে লাদুন্না বা মারেফতের জ্ঞান নাই, তারা জানে না যে ইমাম মালেক বলেন- যে শুধু শরিয়ত করে সে ফাসেক, আর যে শুধু মারেফত করে সে জিন্দিক বা কাফের। তাহারাই পীর-মুরিদ করিয়া আসিতেছে। মোট কথা জাহেরাতে তাহাদের ভিতর শরিয়তের বা পীর মুরিদীর কোনপ্রকার ত্রুটি দেখা যায় না। কিন্তু কামেল পীরদের মুরিদের মধ্যে যে সকল বুঝ খুলিয়া যায়, তাহাদের মুরিদের ভিতর সে সব কিছুই নাই। তাহাদের মুরিদেরা এই মাত্র বুঝে যে, দোয়া দরূদ শিক্ষা করা এবং জাহেরা-শরিয়ত মত চলা, এই বুঝি আল্লাহ পাওয়ার পথ, এই পর্যন্ত মারেফাতের সীমা। তাহাদের শিক্ষায় মুরিদের দিল জিন্দা হয় না। তাহাদের মুরিদের ফয়েজ সম্বন্ধে জ্ঞান নাই অজদ ও গোলবা ইত্যাদি প্রায় চল্লিশ প্রকার জজ্বা আছে, কিন্তু তাহাদের মুরিদগণের কোনপ্রকার জজ্বা সম্বন্ধে জ্ঞান নাই।

রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর (মিয়াণে আশেখ ও মাশুক রমজিস্ত কেরামিন কাতেবীনরা খবর নিস্ত) জামানায় যে সাহাবাদের প্রায় চল্লিশ প্রকার জজ্বা ছিল, তাহাও তাহারা স্বীকার করিতে চাহে না। এমন কি যদি কোন কামেল পীরের মুরিদের ভিতর দুই একজনের জজ্বা দেখে, তবে তাহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া বেড়ায়, আর বলে ইহারা বে-শরা কাজ করিয়া থাকে। ইহারা শরিয়ত মত চলে না। কেহ কেহ নানা প্রকার অকথ্য ভাষায় গালিও দিয়া থাকে। আর গর্ব করিয়া থাকে, আমরা শরিয়তী পীর ধরিয়াছি, আমাদের কাহারও এই প্রকার হয় না।

দুঃখের বিষয় এই যে, পীরসাহেবও রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জামানার কথা ভুলিয়া যান এবং বলিয়া থাকেন রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জামানায় এ সব জজ্বা ছিল না। কিন্তু বর্তমান আক্ষেপের বিষয় রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় যে জজ্বা বহুগুণে বেশি ছিল তাহা পীরসাহেবেরও জানা নাই। অনেক পীরসাহেব জজ্বা সম্বন্ধীয় কিতাবাদী পড়েন-ই নাই, আর কোন পীরসাহেব আছে, তাহাদের মুরিদের ভিতর ওই সকল হালত বা জজ্বা নাই বলিয়া রসুলুল্লাহর জামানার সাহাবিদের জজ্বার বিষয় ধামাচাপা দিয়া আসিতেছে। মোট কথা যে সকল পীরেরা জজ্বা চিনে না বা যে সকল পীরের মুরিদের মধ্যে জজ্বা মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের হইতে দূরে থাকা কতর্ব্য, কেন না তাহারা নাকেচ পীর ও বাতিল পীর।

তরিকা হল ঈমান ও আমলের মধ্যে সংযোগ সেতু

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমার প্রার্থনা কবুল করেন এবং আমাকে একবিংশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, জামানার হাদি খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য দান করেন। তাঁকে দেখে যেকোন সাধারণ মানুষের মত আমিও অভিভূত হয়ে যাই এবং অনুভব করতে থাকি, ইনি-ই সেই পবিত্র মানুষ মহা-আত্মা, ইনি-ই আমার কাঙ্ক্ষিত সংযোগ সেতুর সন্ধান দিতে পারবেন। তারপর থেকে আমি খাজাবাবার সান্নিধ্যে এসেই ঈমান ও আমলের মধ্যে সংযোগরূপ সেতুর হদিস পাই এবং সেই প্রাপ্তির পথে চলার আনন্দময় স্বাদ নিজের হৃদমাঝারে অনুভব করতে থাকি।

কি সেই সংযোগ সেতু আর কেনই বা সেটা দরকার : বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী 'বই পড়া' প্রবন্ধে লিখেছেন– 'শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য আজ ব্যহত। আজ আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাই জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বা ভালো চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে'। সর্বজন প্রিয় এ পণ্ডিত যর্থার্থই বলেছেন ইসলামের আসল উদ্দেশ্য সমাজ আজ থেকে হারিয়ে গেছে, যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও বড় বড় জুব্বা আর ফ্যাটা পাগড়িমার্কা আলেম নামধারীদের দূরাচারের জন্য যাই যাই করছে। কিন্তু আল্লাহর মনোনীত প্রিয় ধর্ম ইসলাম যে জ্ঞানের এক মহা সমুদ্র, আমরা সেই জ্ঞান আহরণের পথে না হেঁটে, এর গভীরতাকে উপলব্ধি করতে না শিখে স্বাদ ও গন্ধ ছাড়া আমল করে চলেছি। এই চর্চা আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে জ্ঞানী ভাব ফুটিয়ে তুললেও আসলে সে জ্ঞান মস্তিষ্ক থেকে মন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আর তাই আজ আমাদের পঙ্গু শিক্ষা ব্যবস্থার মত পঙ্গু আমল দ্বারাও জ্ঞানী মানুষ তৈরি করা যাবে না। বর্তমান সমাজে পোশাকধারী মানুষের সংখ্যা বাড়লেও সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষের, সৎ মানুষের বড়ই অভাব। তাই তো আমার মনে আজ জিজ্ঞাসা, যে শিক্ষা মানুষকে সঠিক জ্ঞানের গুণী করতে পারে না, সে শিক্ষা কি আসলেই প্রকৃত শিক্ষা? ঠিক তেমনি যে আমল ঈমানী শক্তিকে, জ্ঞানকে গভীরতা দান করতে পারে না, মানুষকে সঠিক সত্য ও ধৈর্যের পথ দেখাতে পারে না, অর্থাৎ ঈমান ও আমলের মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে পারে না, সে আমল দিয়ে আর যা-ই হোক না কেন, আমার বিশ্বাস আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। জান্নাত লাভের রাস্তা পাওয়া যাবে না। ঈমানী জ্ঞান গভীর করার জন্য ঈমান ও আমলের মধ্যে সংযোগ-রূপ সেতুর জন্য, আল্লাহ-রসুলের (সঃ) সত্য ইসলামকে (যে ইসলাম শুধু ন্যায়- অন্যায়ের বোধই তৈরি করে না, ন্যায় ও সত্যের পথে চলার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সাহস দান করবে) মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর জন্য, আমার পীর-মুর্শিদকেবলা খাজাবাবা কুতুববাগীর দরবারে আসুন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সত্য ইসলাম ও মহানবী রসুল (সঃ)-এর আদর্শে জীবনকে আলোকিত করি। আমার পক্ষ থেকে প্রত্যেক মানুষের কাছে এ এক উদাত্ত আহ্বান।

কামেল গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক

শেষ পৃষ্ঠার পর

দেহের কাছে আত্মা যেমন প্রিয়, তেমনি আত্মার কাছে পরমাত্মা অতিপ্রিয়। তাদের মধ্যে মেলবন্ধনে দরকার একজন কামেল গুরু এবং নিবেদিত শিষ্য। কামেল গুরুর সঙ্গ দেওয়াই প্রকৃত সৎ সঙ্গ। এক গ্লাস পানিতে এক ফোটা পানি মিশালে যেমন ওই পানি ফোটার অস্তিত্ব আলাদা করা যায় না, তেমনিভাবে মুর্শিদের দিলের সঙ্গে যদি ভক্তের দিল মিশে যায়, তবেই 'কলব' হবে আল্লাহর জিকিরে জাগ্রত এবং অন্তরের চোখে ফুটবে আলো। মিটে যাবে আল্লাহকে দেখার তৃষ্ণা। শাহসূফী সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ শাহ চন্দ্রপুরী (রহ.) বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে ওঠা বসা করার ইচ্ছা করে, অর্থাৎ নৈকট্য লাভ করতে চায়, সে যেন তরিকত পন্থি কোন কামেল পীরের কাছে গিয়ে বাইয়াত হয়ে তাঁর সঙ্গে মিশে যায়' (নূরতত্ত্ব)। এই মিশে যাওয়ার প্রকৃত হাকিকত হচ্ছে, মুরিদের মনে যে কাটা বাসা বেঁধেছে তা সরিয়ে ফেলা। এ কাটা কোন কবিরাজ, সার্জারিয়ান বা মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বের করতে পারে না, বরং ক্ষত আরো বাড়বে ছাড়া কমবে না। এই কাটা বা আত্মার রোগ মুক্তি পাবার একমাত্র পথ হচ্ছে একজন কামেল মুর্শিদ। এই জগতে আমরা হচ্ছি আত্মার রোগী এবং কামেলপীর অলি-আউলিয়ার দরবার শরীফ হচ্ছে হাসপাতাল, আর কামেল পীর-মুর্শিদগণ হলেন সে হাসপাতালে সুচিকিৎসক। আমরা সাধারণ মানুষ যতই জরাগ্রস্থ হই না কেন, যতই পাপী হই না কেন, কামেল অলিগণের কাছে গেলেই মিলবে সকল রোগ মুক্তির মহাঔষধ।

পবিত্র কোরআন-হাদিসেই যখন সৎ সঙ্গ দিতে বলা আছে, সেখানে আমরা বসে বসে শুধু চিন্তা করে অমূল্য সময় নষ্ট করছি আর ভাবছি, পীর-মুর্শিদের কাছে যাওয়া ঠিক হবে কি না! আল্লাহতায়ালা বলেন– 'হে মুমিনগণ! তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহতায়ালার এবং রসুল (সঃ)-এর, আর তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় নেতা' (সূরা নিসা : আয়াত-৫৯)। প্রিয় নবী রসুল (সঃ) বিদায় হজের ভাষণে বলেন– 'তোমাদের নিকট আমি দুটি ভারী বস্তু রেখে গেলাম। যতদিন এ দুটিকে ধরে রাখতে পারবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এর মধ্যে একটি আল্লাহর কিতাব কোরআন, যার মধ্যে ইসলামের সব দিক-নির্দেশনা দেওয়া আছে, আর অপরটি হচ্ছে আমার আহলে বাইয়াত'। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, এখনকার মানুষ শুধু প্রথমটিকেই প্রাধান্য দেয় আর দ্বিতীয়টির ভ্রুক্ষেপ করে না। আর এ কারণেই দিন দিন মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিনয়-ভদ্রতা, শালিনতা আর মানবিকতার দিকগুলো আজ হুমকির মুখে! রসুল (সঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ি না চলাতে আমরা সত্যিই পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছি। দুই হাতের সমান শক্তি যেমন এক হাতে পাওয়া যায় না, তেমনি আহলে বাইয়াত বাদ দিয়ে শুধু কোরআনের আংশিক আমল বুঝে, কিছু না বুঝে আবার অনুমানে ভর করে কেউ কখনোই জান্নাত বা আল্লাহর দেখা পাবে না। আদিপিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে এখন পর্যন্ত আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তার কোন পরিবর্তন আসেনি আর আসবেও না। সকল ক্ষেত্রেই উছিলার মাধ্যমেই দেখা-দেখি, জানা-জানির পথ পাওয়া যায়। হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন– 'তুমি যদি আল্লাহর সঙ্গে মিশতে চাও, তবে চিরতরে কামেলের চরণ ধূলি-সম হয়ে যাও'। চারটি মাজহাবের চারজন ইমাম তাঁরাও পীর-মুর্শিদের মুরিদ ছিলেন। আমার মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর যিনি মাতৃগর্ভ থেকেই অলিত্বের ভার নিয়ে দুনিয়াতে এসে, আমাদের প্রাণপ্রিয় দাদাপীর হযরত শাহ মাতুয়াইলী (রহ.)-এর মুরিদ হয়ে, দীর্ঘ দশ বছর জান-মাল উজার করে আপন পীরের খেদমত করেছেন, শুধু আপন মুর্শিদের প্রেম-মহব্বত অর্জনের জন্য।

একটা ঘটনা বলি, একদিন কয়েকজন লোক আম বাগানের বাহিরে বসে পরামর্শ করছিল, কীভাবে আম চুরি করবে। কেননা গাছের মালিকের হাতে ধরা পড়লে তো তাদের শাস্তি দিবে। সবাই বসে ঠিক করল যে, দুপুরে যখন বাগানের মালিক থাকবে না, তখন সবাই গাছে উঠে আম চুরি করবে। এ সময় তাদের কাছাকাছিই বসে ছিল এক লোক, তাকে কেউ খেয়াল করলো না, যখন বসা থেকে লোকটি দাঁড়িয়ে মুচকি হাসি দিয়ে আস্তে আস্তে বাগানের দিকে গেল এবং বাগানের মালিকের কাছে তার আম খাওয়ার ইচ্ছা জানাল। বাগানের মালিক তার লোক দিয়ে কিছু আম এনে লোকটিকে দেয় এবং সে তৃপ্তি মিটিয়ে আম খেয়ে চলে গেল। এই দৃশ্য দেখে বাগানের বাহিরে বসে থাকা সেই লোকগুলো বুঝতে পারলো, আজ যদি বাগানের মালিকের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকত, তবে আর চুরি করতে হতো না। উল্লেখিত ঘটনার মাধ্যমে বোঝা গেল যে, আপন পীরের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক যত গভীর হবে, তাদের চাওয়া পাওয়া ততই দ্রুত পূরণ হবে। যে যত বেশি কামেল পীরের মহব্বত হাসিল করবে, তার আত্মা তত বেশি শুদ্ধ হবে এবং সে তত তাড়াতাড়ি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।

বাবাজানের কাছে আসলে ঈমানী শক্তি বেড়ে যায়

মোঃ নুরুল আমিন বাবু

বাবাজানের কাছে এলে ঈমানী শক্তি বেড়ে যায়, রসুল (সঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হয় এবং শুধু এক আল্লাহর প্রতি মূখাপেক্ষী করে তোলে। দেখতে দেখতে প্রায় ছয় বছর হয়ে গেলো বাবাজানের সান্নিধ্য লাভ করেছি। বাবাজানের কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করি। বাবাজানকে দেখলে রসুল (সঃ)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা জাগ্রত হয়, আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব হয়, অন্তরে আল্লাহর স্মরণ বেড়ে যায়। আমার দুর্বল মন স্ব-বল হয়ে ওঠে। বাবাজানের কাছে বাইয়্যাত গ্রহণ করার পর অজিফা আমল নিয়মিত পালন করছি। এই অজিফা আমল হলো ফজর নামাজের পর ফাতেহা শরীফ পাঠ এবং খতম শরীফের আমল। জোহর নামাজের পর দুই রাকাত নফল শরীফ, আসর নামাজের পর তসবিহ ফাতেমী, মাগরিব নামাজের পর দুই রাকাত নফল শরীফ ও ফাতেহা শরীফ পাঠ করা। এশার নামাজের পর দুই রাকাত নফল শরীফ ও রসুল (সঃ)-এর প্রতি পাঁচশত বার দরূদ শরীফ পড়ে নজরানা পেশ করা। এই আমলগুলোর সঙ্গে বাবাজান এর শিখানো আরও কিছু আমল করে থাকি। এর মধ্যে প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় হলেও ধ্যান-মোরাকাবা করা। বাবাজান আরেকটি শিক্ষা হলো, প্রতি নি:শ্বাসে আল্লাহর জিকির করা। প্রতি রাতের শেষ ভাগে উঠে আল্লাহর তিন নাম ধরে ডেকে রহমত পালন শিক্ষা দিচ্ছেন। এই তিন নাম হলো ইয়া আল্লাহু! ইয়া রাহমানু! ইয়া রাহিম! মাঝে মাঝে ইয়া রহমাতাল্লিল আলামিন' বলে ডাকতে। আমি প্রায় প্রতি বৃহস্পতিবার-ই দরবার শরীফে বাবাজানের সাথে রহমত পালন করে থাকি।

বাবাজানের বড় কেরামত হলো, মানুষকে আল্লাহ ও রসুল (সঃ)-এর মূখী করা।

বাবাজানের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা : আমাদের এলাকা শেওড়াপাড়ার পরিচিত এক ভাই বললো– 'বাবু ভাই, আমাকে আজকে বাবাজান এর কাছে নিয়ে যাবেন? বাইয়াত গ্রহণ করব এবং মনের কিছু কথা তাঁকে বলবো। ওইদিন ছিলো বৃহস্পতিবার, আমি বললাম ঠিক আছে নিয়ে যাব। তার নাম হুসেন,। বিকাল থেকে অপেক্ষায় আছেন দরবারে আসার জন্য। আমার সাইনাসের সমস্যা আছে, এ কারণে ধূলোবালির মধ্যে মাস্ক ব্যবহার করে চলতে হয়। আগের দিন বুধবার ঢাকার বাহিরে গিয়েছিলাম, ওই সময় মাস্ক ব্যবহার করিনি। শীতকাল, ধূলোবালি বেশি উড়ে।

বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই নাকের সমস্যাটা বেড়ে গেলো। এদিকে হুসেন ভাইকেও কথা দিয়েছি, সে অপেক্ষা করছে। যা হোক, হুসেন ভাইকে রাত আটটার দিকে বললাম, ভাই আজ যেতে পারছি না, আপনাকে পড়ে কোন এক দিন নিয়ে যাব। বাবার প্রতি হুসেন ভাইয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা দেখে আমার ভালো লাগলো। কিন্তু তাকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় রেখে দরবারে নিয়ে আসতে না পারায় খুব খারাপ লাগলো। রাতে ঘুমোতে গেলাম, স্বপ্নে দেখি– আমি দরবারে, বাবাজান আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, নাকে সমস্যা হচ্ছে কেন? এবং এর জন্য কিছু উপদেশ দিলেন, এমন সময় দেখি হুসেন ভাই আমার পিছনে দাঁড়ানো। ঘুম ভাঙ্গার পর চিন্তা করতে লাগলাম হুসেন ভাইয়ের কথা। সিদ্ধান্ত নিলাম হুসেন ভাইকে অবশ্যই আগামী বৃহস্পতিবার দরবার শরীফে নিয়ে যাবো। কিন্তু বৃহস্পতিবারের আগেই হুসেন ভাই মারা গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমার মন ভিষণ খারাপ হয়ে গেল। বাবাজান আল্লাহর অলি-বন্ধু, তাঁর জাবানে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, বান্দা যখন আমার হয়ে যায়, আমি তখন বান্দার হয়ে যাই। আমি যে চোখ দিয়ে দেখি, তখন বান্দাও সে চোখ দিয়ে দেখে। আমি যে কান দিয়ে শুনি বান্দাও সে কান দিয়ে শুনতে পায়। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয়, সেদিন বাবাজানের কাছে হুসেন ভাইয়ের আসার অভিব্যক্তি এবং আমার অসুস্থতা বাবাজানের আধ্যাত্মিক চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তো বলি খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান আল্লাহতায়ালার সুমনোনীত অতিপ্রিয় অলি-বন্ধু। তাঁকে মেনে নেওয়া মানেই রসুল (সঃ)-এর আহলে বাইয়াত মেনে নেওয়া এবং আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করা। আর মেনে নিতে পারলেই কেবল এ জগতে শান্তি আর পরকালে মুক্তির পথ নিশ্চিত করা।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে সূফীবাদের শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাত্ত্বিক দিক নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করার নির্দেশ কোরআন মজিদেই রয়েছে। এছাড়াও দয়াল নবীজির পবিত্র জবান নিসৃত অনেক মূল্যবান বাণী বিভিন্ন হাদিসে রয়েছে, যেখানে সূফীবাদের মূল কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সূফীবাদের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে পর্যাক্রমে, মদিনার মসজিদে নববীতে একদিন হযরত আলী (রাঃ) সূফীবাদ বা তাসাউফ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় কতিপয় সাহাবি বিরুপ মন্তব্য করলে হযরত আলী (রাঃ) রাগত স্বরে বললেন– 'তোমরা চুপ থাকো, আমি ও খাদিজা ব্যতীত আর কোন সাহাবি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রসুল (সঃ)-কে দেখেনি'। হযরত আলী (রাঃ)-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রকাশের পূর্বেও রসুল (সঃ) সূফীবাদ বা তাসাউফ সাধনা করতেন এবং সাধনারত অবস্থায়-ই পবিত্র কোরআন মজিদ নাজিল হয়।

রসুল (সঃ) যে এলেম শিক্ষা দিয়েছিলন তা ছিলো মূলত দুই ধরণের, এলমে শরিয়ত ও এলমে মারেফত। আর এই দু'টি এলেমের সর্বোত্তম সমন্বয়ে ইসলাম সুপ্রষ্ঠিত হয়েছিলো। শরিয়ত ও মারেফতের সমন্বয়ে নিজের জীবন পরিচলিত করে রসুল (সঃ) তা উম্মতের জন্য মহান আদর্শ নির্ধারণ করে গেছেন। পবিত্র কোরআন নাজিলের শুরু থেকেই সূফীবাদ বা তাসাউফ তত্ব মহান আল্লাহর নিকট হতে রসুল (সঃ)-এর নিকট আসতে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রসুল (সঃ) এসবের ব্যাখ্যা করেছেন। মহান আল্লাহ কোরআনে বলেন– 'তোমাদের জন্য শরিয়ত এবং মিনহাজ দিয়েছি'। সুতরাং আল্লাহতায়ালা দু'টি বিধান রসুল (সঃ)-এর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে দান করেছিলেন। প্রথমত: শরিয়ত হলো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের নিয়ম-নীতি। যা রসুল (সঃ) সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পর্যায়ক্রমে এসেছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। যেমন-বাহ্যিক চালচলন, আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম, এবাদত-বন্দেগী, পরিবার-সংসার, সমাজ-সংস্কৃতি, রাষ্ট্র-অর্থনীতি ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: মিনহাজ, এর আভিধানিক অর্থ হলো– খাস পথ, সরল পথ, সহজ পথ, আসল পথ, গোপন পথ। আর মহাত্মাগণ মিনহাজকেই তাসাওফ বা সূফীবাদ বলে নির্দেশ করেছেন। মহান আল্লাহ কোরআনে আরো বলেন– 'আজ তোমাদের দ্বীনকে আরো পরিপূর্ণ করে দিলাম'।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন– 'এমন একটা গোপন বিদ্যা রয়েছে যা ঝিনুকের অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত মনির ন্যায় সুপ্ত অবস্থায় আছে। এ জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহর অলিগণই অবগত' (হাদিস)। 'নিশ্চই বাতেন এলেম আমার একটা গোপন রহস্য যা আমি আমার বিশেষ বান্দাদের অন্তকরণে উদয় করি। আমি ছাড়া আর কেউ এ গোপন তত্ত্বজ্ঞান অবগত নয়' (হাদিসে কুদসি)। অপর দিকে রসুল (সঃ) আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্জের ভাষণে এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষকে সাক্ষ্য রেখে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কি আল্লাহর বাণী যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি? উপস্থিত সকলে একবাক্যে তিনবার জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। তাহলে এ থেকেও প্রমাণিত হয়, রসুল (সঃ) শরিয়তের পাশাপাশি মিনহাজ তথা তাসাওফ বা সূফীবাদ সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে রসুল (সঃ) সাধারণ সাহাবিদের কাছে তাসাওফের দর্শনতত্ব প্রকাশ করেন নাই। দয়াল নবীজি দিব্য দৃষ্টিতে যার ধারণ ক্ষমতা আছে বলে মনে করেছেন বা দেখেছেন, এমন কিছু সংখ্যক সাহাবিকে মিনহাজের জ্ঞান দান করেছিলেন। শরিয়ত ও মিনহাজ উভয় প্রকার জ্ঞান শুধু দানই নয়, নির্দেশও দিয়ছেন যেন তাঁরা রসুল (সঃ)-এর অনুপস্থিতে এ শিক্ষাদ্বয় অনুপস্থিতগণের কাছে পৌছায়। আর অনুপস্থিতগণের কাছে শিক্ষাদ্বয় পৌঁছানো একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

রসুল (সঃ) যাঁদেরকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন তাঁরা ঘর-বাড়ির মায়া প্রায় ত্যাগ করে মসজিদে নববীর বারান্দায় বসে থাকতেন, কারো মতে এঁদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৪৭০ (চার'শ সত্তর) জন এবং এসব বিশেষ সাহাবিকে আহলে সূফফা বলা হতো। আহলে বা আসহাবে সুফফাগণ সরাসরি রসুল (সঃ)-এর কাছ থেকে এলমে তাসাওফ বা সূফীবাদের শিক্ষা গ্রহণের মহতী সুযোগ পেয়েছিলেন। এ সূফীসাধকগণ আল্লাহ ও রসুল (সঃ)-এর প্রেমে মত্ত হয়ে বেশিরভাগ সময় মোরাকাবা-মোশাহেদা-ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। সূফী-সাধকগণ মোটামোটি দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণি ছিলেন যাঁরা তাসাওফ শিক্ষার মাধ্যমে আত্মোন্নতি সাধন করেছিলেন, এঁরা শুধু সাধক ছিলেন। অপর শ্রেণি সাধনার মাধ্যমে আত্মোন্নতি করে তাসাওফ বা সূফীবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন, এঁরা ছিলেন সাধক ও প্রচারক। শুধু আহলে সূফফাগণ নয়, রসুল (সঃ) নিজেও তাসাওফ বা সূফীবাদের চর্চা করতেন। রসুল (সঃ) চিরদিনই আড়ম্বরহীনতা পছন্দ করতেন। অল্প খাদ্য, অল্প নিদ্রা, অল্প কথা বলা নবীজির অভ্যাস ছিলো। অধিক পরিমানে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যান-মোরাকাবা-মোশাহেদা করতেন। মিরাজের পবিত্র রজনীতে আল্লাহতায়ালা তিরিশ হাজার একান্ত গোপন এলেম রসুল (সঃ)-এর পবিত্র কলবে আমানত রাখেন। এ গুপ্ত এলেম থেকে আহলে সূফফাগণ ও অত্যাধিক প্রিয় কয়েকজন সাহাবিকে কিছু পরিমানে দান করেছিলেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওফাতের পর কিছু কিছু আহলে সূফফা এবং বিশেষ কিছু সাহাবি কর্তৃক তাসাওফ বা সূফীবাদের প্রচার-প্রসার শুরু হয়। আহলে সূফফার সদস্যগণের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েজন দয়াল নবীজির ওফাতের পর তাসাওফ বা সুফীবাদ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানে ব্রত ছিলেন। এঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত সালমান ফারসি (রাঃ), হযরত আবু জর গিফারি (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ), হযরত মিকদাদ (রাঃ), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ), হযরত মায়াদ (রাঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিজরতের ঝুকিপূর্ণ যাত্রায় রসুল (সঃ)-এর বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে সার্বক্ষণিক সঙ্গে ছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য, তাঁর সকল ধন-সম্পদ রসুল (সঃ)-এর পদমূলে ঢেলে দিয়েছিলেন। এছাড়াও উম্মুল মোমেনিন হযরত মা আয়েশা (রাঃ)-এর পিতা হিসেবেও দয়াল নবীজির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাসাওফ বা সূফীবাদের জ্ঞান রসুল (সঃ)-এর নিকট থেকে সরাসরি লাভ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর হাত ধরেই নকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকা প্রচার শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সৃষ্টির কুল কায়েনাতের মূল উৎস দো'জাহানের নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে অসংখ্য ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া বা বেলায়েতে মাশায়েখগণ আগমন করেছেন এবং করতে থাকবেন। বর্তমান বিশ্বের পাপী-তাপী-গুনাহগার ও পথভ্রষ্ট মানুষেদের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দিতে সূফীবাদের শিক্ষক হিসেবে শুভাগমন করেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধক, হেদায়েতের হাদী নকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বর্তমানে একমাত্র খেলাফতপ্রাপ্ত পীর-মুর্শিদ খাজাবাবা আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর। তিনি কুতুববাগ দরবার শরীফের সদর দপ্তর ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র নির্বিশেষ সকলকে আত্মশুদ্ধির দীক্ষা দেন। দয়াল নবীজির সত্য তরিকায় শামিল হতে সকলকে আহবান জানাচ্ছি।

লেখক : খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ
সভাপতি, পদক্ষেপ বাংলাদেশ

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর
–আল কোরআন

আমার আলো

তরিকা হল ঈমান ও আমলের মধ্যে সংযোগ সেতু

মেহেদুল ইসলাম মাহি

বেশ কয়েক বছর আগে জনৈক ইসলামী এক বক্তাকে তার এক বক্তৃতায় বলতে শুনেছিলাম, ঈমান ও আমলের মাঝখানে সংযোগ না থাকায় মুসলিম সমাজের আজ দূরাবস্থা। কথাটা আমার কাছে অত্যন্ত যুক্তিসংগত মনে হয়েছিল। তারপর থেকেই আমি ঈমান ও আমলের মধ্যে সংযোগ সেতুর সন্ধান করতে থাকি। অনেক বড় বড় আলেম-ওলামা, জ্ঞানী-গুণী থেকে শুরু করে কতজনের কাছেই কত জিজ্ঞাসা নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু সদুত্তর তথা আমার কাঙ্ক্ষিত সেই সংযোগ সেতুর ঠিকানা কেউ দিতে পারেন নি। আমি তখন অনেকটাই আশাহত হয়ে পড়ি। এ অবস্থায় আমার শ্রদ্ধেয় মামার কাছে তরিকতের শিক্ষার রাস্তার কথা জানতে পারি, যা কিনা আমাকে হিতে বিপরীত করে তোলে। কেননা এতদিন ধরে অলি-আউলিয়া এবং তাঁদের মাজার শরীফ সম্পর্কে কটুক্তি ও মিথ্যাচার শুনে ও ভুল বুঝে মনে যে নেতিবাচক ধারণা করেছিলাম, সেটা অতিক্রম করে তরিকত এর পথে পদচারণা করার কথা কিছুতেই ভাবতে পারতাম না। এ অবস্থায় আমি তরিকা জানার ও বুঝার জন্য অনেক শ্রদ্ধেয় অলি-আউলিয়ার জীবনী এবং তাঁদের লেখা বই সংগ্রহ করে পড়ার চেষ্টা করি। আমার এই চেষ্টারত থাকার এক পর্যায়ে মহান আল্লাহর অশেষ দয়ায়, আমি উপলব্ধি করতে পারি যে, তরিকার রাস্তায় গেলেই আমি সেই কাঙ্ক্ষিত সংযোগ সেতুর সন্ধান পাব। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা করতাম যেন, তিনি আমায় সেই সংযোগ সেতুর সন্ধান দান করেন। একসময় মহান আল্লাহ ২-এর পাতায় দেখুন

আল্লাহর দেখা পাবো না কেউ প্রেম জগতে না গিয়ে

সাইফুল ইসলাম দীপক

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের সূফীবাদের স্কুলে পড়তে এসে যত কিছুই শিখলাম, তার মধ্যে একটা বিষয় আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, সে বিষয়টা হল প্রেম! এ শব্দটার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, বুঝে না বুঝে এর ব্যবহারও করি প্রচুর। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর গভীর উপলব্ধি ক'জনার হয়? শুধু মুখে ভালোবাসি বললেই ভালোবাসা হয় না। এক সাধক কবি বলেছেন– 'আশেকের ভেদ মাশুক বোঝে, যে যার পীরিতে মজে'। খাজাবাবা কুতুববাগী বলেন– 'বাবা, প্রেম কখনও একা একা হয় না'। আশেক আর মাশুক না হলে প্রেম হয় না। জোর করেও প্রেম করা যায় না। যখন হবে তখন এমনিই বোঝা যায়, কারো বলে দিতে হয় না। আমি সেই চিরন্তন প্রেমের কথা বলছি, যে প্রেমে কোনো সংকীর্ণতা নাই, যে প্রেম শ্বাশত। যে প্রেমে সবকিছু উজাড় করে দিতে চায় মন এবং কিছুই বিনিময় চায় না। আশেক চায় শুধু মাশুকের মন। বস্তুত পক্ষে প্রেম দুই রকম, এশকে মাজাজী ও এশকে হাকীকি। এশকে মাজাজী হল দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা, যা শুধু পার্থিব জীবন শেষ হলেই এ প্রেমের সমাপ্তি ঘটে। আর এশকে হাকীকি পার্থিব জীবনের পরেও অক্ষুণ্ন থাকে, কারণ এ প্রেম শুধু আল্লাহর জন্য। এশকে হাকীকিতেই আল্লাহর সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিষয়টা অনেক গভীর বিষয়। আমার মত মূর্খের পক্ষে এ নিয়ে লেখা দুঃসাহস ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতি মূহুর্ত ভয়ে কাটে, কিছু ভুল হয়ে গেল মনে হয়।

আসলে লেখার মত জ্ঞান আমার নাই। তবুও আমার গুরু খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান লিখতে বলেন, তাই আমি অধম নালায়েক চেষ্টা করছি। আশা করি ভুল-ত্রুটি খাজাবাবা মাফ করবেন। এশকে হাকীকি হল আল্লাহর সঙ্গে প্রেম। কিন্তু সেই প্রেমের স্তরে পৌঁছাতে অন্তরে আখেরী নবীজির প্রতি গভীর মহব্বত থাকতে হবে। আজকাল একদল নামধারী আলেম আছে, যারা মানুষকে ভুল শিক্ষা দিয়ে নবীজির প্রেম-মহব্বত থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। তারা বলে সরাসরি আল্লাহকে পাওয়া যায়। তাদেরকে বলি, আপনারা এমন আত্মঘাতী আকিদা ত্যাগ করে সত্য এবং ন্যায়ের পথ অনুসরণ করুন, তবেই শান্তি ও মুক্তি আসবে। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ-ই যেখানে তাঁর হাবিবপাকের প্রেমে মশগুল, সেখানে আপনারা শত চেষ্টা করেও সফল হতে পারবেন না। আল্লাহ-নবীর প্রেম যে বোঝে না, তার আর যাই হোক আল্লাহকে পাওয়ার কোন আশা থাকতে পারে না। কেউ হয়ত বলবেন, এটা আবার কেমন কথা! সব মুসলমানই নবীজি (সঃ)-কে ভালোবাসে। ঠিক আছে আসেন দেখি সেই ভালোবাসা অন্তরে কতখানি লালন করেন তা একবার পরখ করে দেখুন। কেউ যদি কাউকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে তার কথা সে কখনও ফেলতে পারে না কিংবা ভুলতেও পারে না। তাহলে নবীর শিক্ষা মানুষকে ভালোবাসা, সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, মিষ্টভাষী হওয়া, অন্যের হক নষ্ট না করা, অন্যের সম্পত্তি দখল না করা, অন্যের মনে আঘাত না দেয়া, মিথ্যা না বলা, ভুখা মানুষকে খাবার দেয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয়া, মানব সেবা করা, গীবত না করা ইত্যাদি। এখন বলেন, আপনি-আমি এর কতটুকু পালন করতে পেরেছি। এর কারণ, সত্যিকার অর্থে নবীপ্রেম আমাদের মধ্যে নাই। আমাদের প্রেম মুখে ২-এর পাতায় দেখুন

কামেল গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক

মোঃ আবুল খায়ের অনিক

'মুর্শিদের প্রেমে পুড়ে যার অন্তর হইছে ছাই, তার দেহ মাটি খাবে, মাটির এমন সাধ্য নাই'। কামেল পীরের অনুসরণ ও অনুকরণ করার মানেই হচ্ছে তাঁদের মত প্রকৃত সাধক হওয়া, তাঁদের প্রেম-সাগরে ডুবে থাকাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন। যত বড়-ই দ্বীনদার; মুরিদ হন না কেন, পীরের মহব্বত অন্তরে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত, আমরা কখনোই মুমিন হতে পারবো না। যারা অলি-আল্লাহদের প্রেমে মজে গেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কোন চিন্তা নেই। পরপারের কাণ্ডারী বা সাথীকে যে যত আপন করে নিতে পেরেছেন, তিনি তত আগেই সুপথ পেয়ে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– 'যে ব্যক্তি যেমন লোককে ভালোবাসে, পরকালে সে তেমন লোকের সঙ্গেই থাকবে' (বুখারী ও মুসলিম)। তাই একজন প্রকৃত গুরু ভক্তের জানা হয়ে যায় কি করলে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায়। ৩-এর পাতায় দেখুন

TMI
দেশ ও জনগণের সেবায় সাফল্যের ১০ বছর
আসুন সূফীবাদের শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করি।
Proprietor
Mohammad Zafar Hossain
Tan-Man International
Contractor (MES) Bangladesh, Army, Air, Navy, BGB
আস্থা এবং অভিজ্ঞতাই আমাদের অর্জন...
21/ B, Kawran Bazar Lane (Garden Road), Tejgaon, Dhaka- 1215
P/Off : 88/ B & C, Lack Circus, Kalabagan, Dhaka- 1205
Cell : 01912014495, 019111 70294, 015534 62702
E-mail : tanmanzafar@yahoo.com, Tanmaninternational15@gmail.com

HLM Developer & Builders
HAZI LAT MIAH DEVELOPER & BUILDERS LIMITED

মোহাম্মদপুরে নিজস্ব জমিতে সুন্দর লোকেশন, মনোরম পরিবেশ ও আকর্ষণীয় মূল্যে তৈরি ফ্ল্যাট বিক্রি চলছে...
আগ্রহী ক্রেতাগণ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন
CONTACT US
Plot # 228/ A Road # 6
Mohammadi Housing Ltd. Mhoammadpur, Dhaka-1205
Telephone : ++ 880208125330, +8802-8105026
Email : info@hlmdeveloperandbuilders.com Web :

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুবাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুবাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.